প্রচ্ছদ কাহিনী

কে নিবেন কাপ

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ/ মিশায়েল আহ্‌মাদ**

লা হয়, প্রতিবার সেমিফাইনালিস্টদের মধ্যে একটি দল থাকে আন্ডারডগ। কিন্তু বিশ্বকাপের এই আসর যেন আন্ডারডগদের দলেই। চারটি দলের কেউই ফেভারিটদের মধ্যে ছিলো না। পাশাপাশি ভেঙেছে ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকার আধিপত্য। স্বাগতিক

উপহার পাওয়া প্রথম গোলের উল্লাস

নিষ্প্রভ ওয়েন করেছেন কাজের কাজটি

দল দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছাবে না এমন আশঙ্কাও ছিল। সবাইকে চমকে দিয়ে উঠে এসেছে দক্ষিণ কোরিয়া। তারা সেমিফাইনালে পৌঁছেছে শক্তিশালী ইউরোপীয়দের মোকাবেলা করে। জার্মানিকে অনেকে বলছিলো এবারের ডার্ক হর্স। তাদের খেলাও তেমন ধারালো ছিলো না। তবে সেমিফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি বাধাই অতিক্রম করেছে। তুরস্ককে নিয়ে কেউ চিন্তাই করেনি। বড়জোর দ্বিতীয় রাউন্ড। সেমিফাইনালে কোরিয়ার মতো তারাও এই প্রথম। আরেক সেমিফাইনালিস্ট ব্রাজিল ছিল চরম উপহাসের পাত্র। চারজন কোচ আর ৬২ জন খেলোয়াড় নিয়ে ব্রাজিল কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই ছিটকে যাচ্ছিল। সেমিফাইনালিস্টদের মধ্যে বর্তমানে ব্রাজিলই ফেভারিট।

বিশ্বকাপের বাকি আর চারটি খেলা। সাধারণত এ পর্যায়ে থাকে বড়সড় দলগুলো। লড়াই চলে সেয়ানে সেয়ানে। এবারের সেমিফাইনালের ফলাফল বলা আপাতভাবে সহজ হলেও নিশ্চিত বলা যায় না। বোদ্ধাদের ভবিষ্যদ্বাণী বারংবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই অঘটনই যেন এবারের আকর্ষণ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এবারের লেখায় আলোচনা করা হয়েছে ৪ সেমিফাইনালিস্ট নিয়ে।

সাম্বা কিং ব্রাজিল

হাসিমুখে মাঠ ছাড়ছেন রোনালদিনহো। তাকে ঘিরে সতীর্থদের ভিড়। সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দুর্দান্ত এক ম্যাচ খেলার জন্য।

বিশ্বকাপ আরো একবার হতাশ করলো বেকহামকে

ইংল্যান্ড-ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে এ দৃশ্যটিই ছিলো স্বাভাবিক। পিছিয়ে পড়া ব্রাজিলকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। প্রথমে রিভালদোকে সমতাসূচক গোলের বল তৈরি করে দিয়ে, পরে অসাধারণ এক ফ্রি-কিকে নিজেই আরেক গোল করেন। অথচ রোনালদিনহো যখন মাঠ ছাড়লেন, ম্যাচের আয়ু তখন ৫৭ মিনিট। বিতর্কিত এক সিদ্ধান্তে সরাসরি 'ম্যাচিং অর্ডার' পেয়ে যান তিনি। এগারো জনের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দশজনের ব্রাজিল কতক্ষণ পারবে? 'আমিই ম্যাচে ফেরালাম ব্রাজিলকে, সেই আমিই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়লাম'— এ কথা ভেবেই কি মাঠ ছাড়ার সময় অমন 'ক্রীতদাসের হাসি' হাসছিলেন ছোট রোনাল্ডো? আমরা জানি না। তবে এটা নিশ্চিত, এ ম্যাচে ব্রাজিল জয়ী হবার পর পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভর মানুষটির নাম রোনালদিনহো। যিনি সম্পূর্ণ একক ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ব্রাজিলকে তুলে এনেছেন সেমি ফাইনালে। এখন যিনি জাতীয় বীর, ম্যাচটা হেরে গেলে তাকেই পরিণত হতে হতো জাতীয় শত্রুতে।

অথচ এই ব্রাজিল যে এবারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারবে, বিশ্বকাপ

শুরুর সময় এ কথা জোর গলায় বলার লোক খুব বেশি ছিলো না। ব্রাজিলের গোড়া সমর্থকরাও দলের সামর্থ্য নিয়ে সংশয়ে ছিলো। তাদের অবশ্য দোষ দেয়া যায় না। কারণ গত দু'বছরে ব্রাজিল এমন ফুটবল খেলেছে যে তাদের নিয়ে খুব বেশি উচ্চাশা করা হতো বোকামি। বাছাই পর্বে কোচ পাল্টেছে চারবার। বিভিন্ন ম্যাচে হেরেছে হণ্ডুরাস, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের কাছে। এর আগে ইতিহাসে বাছাই পর্বে তারা ম্যাচ হেরেছিলো মাত্র ১টি। [উল্লেখ্য, প্রতিটি বিশ্বকাপেই তারা অংশ নিয়েছে।] অথচ এবার ১৮ ম্যাচে তারা হেরেছে ৬টি ম্যাচ। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। বিশ্বকাপে খেলা নিয়েই এক সময় ব্রাজিলের সংশয় দেখা দিয়েছিলো। অন্য লাতিন দল আর্জেন্টিনা যেখানে সমগ্র বাছাই পর্বে একজন কোচের অধীনে ২৮ জন খেলোয়াড় ব্যবহার করেছে, সেখানে চার কোচের অধীনে ব্রাজিলকে ব্যবহার করতে হয়েছে ৬২ জন খেলোয়াড়। ভাগ্য তাদের সহায় ছিলো। শেষ খেলায় হোম গ্রাউন্ডে ব্রাজিল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলো দুর্বলতম ল্যাতিন দেশ ভেনিজুয়েলাকে। ৩-০ গোলে হারিয়ে তবেই না কোরিয়া-জাপানের টিকিট পায় ব্রাজিল।

বার বার কোচ বদল করা কোনো দলের জন্যই ভালো ফল বয়ে আনে না। কারণ প্রত্যেক কোচের আলাদা কোচিং দর্শন থাকে। সেই দর্শনটি তারা খেলোয়াড়দের ভেতর সঞ্চালিত করেন। এজন্য সময়ের প্রয়োজন। ৪ মাস কিংবা ৬ মাসে এটা সম্ভব নয়। কোচ, সেই সঙ্গে খেলোয়াড়দের সেজন্য সময় দিতে হবে। ব্রাজিলের গত তিনটি কোচকে সে সময় দেয়া হয়নি। সাফল্যের জন্য মরিয়া হয়ে তারা বার বার কোচ পাল্টেছে। শেষে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন বেছে নিয়েছে এমন একজনকে, যাকে আর যাই বলা হোক, শিল্পমণ্ডিত ফুটবলের ভক্ত বলা যাবে না। 'বিগ ফিল' নিকনেমের লুই ফিলিপ স্কলারি দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করলেন যে, মৃত্যু ঘটেছে সৌন্দর্যের ফুটবলের। সময় এসেছে রেজাল্টের জন্য খেলার। তিনি আরো বললেন, বর্তমান ব্রাজিল দলের কাছ থেকে '৬০ ও '৭০-এর দশকের ফুটবল আশা করা বোকামি। ব্রাজিল এখন থেকে ডিফেন্স জমাট করে আক্রমণে যাবে। ৭/৮ জন খেলোয়াড় সবসময় রক্ষণভাগ সামলাবেন। মাতম উঠলো ব্রাজিল জুড়ে। ফুটবল তো তাদের কাছে শুধু খেলা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ব্রাজিলিয়ানরা সাম্বার তালে তালে ফুটবল খেলা দেখতে চায়, ইউরোপিয়ান দলগুলোর মতো একঘেয়ে রক্ষণাত্মক স্টাইলে নয়। সে কারণেই ১৯৯৪ সালে ২৪ বছর পর বিশ্বকাপ জয় করে দেশে ফিরলেও সেবারের ব্রাজিল দলকে নিয়ে খুব

বাকরুদ্ধ ব্রাজিল, ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় পেলো ম্যাচিং অর্ডার

বেশি মাতামাতি করা হয়নি। বিগ ফিলের এ ঘোষণায় দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলো। কিন্তু নিজ নীতিতে অটল স্কলারি। ফেডারেশনের আস্থাও ছিলো তার ওপর। ব্রাজিলকে যেভাবেই হোক, তুলে আনলেন ফুটবল মহাযজ্ঞের মূল মঞ্চে।

এরপরই শুরু হয় বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি। ব্রাজিলিয়ান লীগের খেলোয়াড়দের খুঁটিনাটি স্কলারির জানা। তিনি বেরিয়ে পড়েন ইউরোপ সফরে। বিশ্বকাপের জন্য সম্ভাব্য সেরা খেলোয়াড়দের পরখ করতে। শুধু ভালো খেলোয়াড় হলেই হবে না, তাকে ব্রাজিল দলের ফর্মেশনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সেদিক উপযুক্ত না হবার কারণে স্কলারি দলে নেননি পর্তুগিজ লীগে খেলা ফরোয়ার্ড মারিও জার্ডেলকে। অথচ এই জার্ডেল স্কলারিরই আবিষ্কার এবং তার খুব প্রিয় খেলোয়াড়। কিন্তু ক্লাব পর্যায়েই সে বেশি কার্যকরী, জাতীয় দলে তার খেলায় ততোটা ধার থাকে না। নেননি বুন্দেসলীগার সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা অ্যামারোসো ও এলবারকে। বাদ দিয়েছেন জে বরার্টোকেও। তবে তারা কেউই অতোটা আলোচনায় আসতে পারেননি, যতোটা এসেছেন রোমারিও। দলে জায়গা পাবার জন্য কি না করেছেন তিনি? ম্যাচের পর ম্যাচ গোল করেছেন, উদ্ধত স্বভাব ভুলে গিয়ে রীতিমতো কেঁদেকেটে দলে জায়গা ভিক্ষে করেছেন। কিন্তু স্কলারির কোচিং দর্শনের মূল জিনিসটি হলো শৃঙ্খলা। রোমারিও'র মতো একজন উচ্ছৃখলকে দলের সঙ্গে কোরিয়া-জাপান নিয়ে যাওয়া তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেননি। শৃঙ্খলাজনিত কারণে আরেকজন বাদ পড়া খেলোয়াড় হলেন স্প্যানিস লীগে ডেপের্টিভো লা করুনার জালমিনহা। ব্রাজিল দলে তার জায়গা ছিলো সুনিশ্চিত। স্কলারি তাকে সেরকম ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কিন্তু দল ঘোষণার মাত্র কিছুদিন আগে ক্লাবের কোচের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ফলে রোমারিও'র ভাগ্য বরণ করতে হয়ে জালমিনহাকেও।

বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগেই প্রায় দু'বছর পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফেরেন রোনাল্ডো। রিভালদোকেও জাতীয় দলের পক্ষে তার সেরাটা দেবার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কোচ ফিরিয়ে আনেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইতে খেলা রোনালদিনহোকে। যুগোস্লাভিয়া ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে প্রাক-বিশ্বকাপ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচগুলোতে এই 'ট্রিপল আর' ফর্মেশন ভয়াবহভাবে জ্বলে ওঠে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে প্র্যাকটিস করার কারণে তারা একে অপরকে বোঝার জন্য যথেষ্ট সময় পান। কিন্তু আঘাতটা আসে এ সময়ই। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের ঠিক দু'দিন আগে আহত হন অধিনায়ক এমারসন। গা-জোয়ারি ফুটবল খেলার জন্য যিনি ব্রাজিলে খুবই নিন্দিত। কোচিং-স্টাইলের কারণে এই এমারসনই হয়ে উঠেছিলেন কোচের ভরসার পাত্র। কিন্তু ইনজুরড্ হবার কারণে এমারসন দেশে ফিরে গেলে স্কলারি দলের কৌশল পুরোপুরি পাল্টে ফেলেন। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এমারসনের পরিবর্তে তিনি প্রথম একাদশে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুনিনহোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রুপ পর্যায়ের ড্র-টি এক্ষেত্রে স্কলারিতে সাহায্য করেছে। প্রতিপক্ষ সহজ হবার কারণে তিনি এই ঝুঁকি নিতে পেরেছিলেন। তবে এখানে স্কলারির কৃতিত্বটা

রোনালদিনহো

১৯৯৭ সালে মিশরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ব্রাজিলের রোনাল্ডো। অবাক হবার মতোই ব্যাপার। রোনাল্ডো তখন বার্সিলোনার সুপার স্টার। একের পর এক দুর্দান্ত গোল করে যে নিজেকে প্রমাণ করেছে বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ জিতেছে '৯৬ সালের 'ফিফা প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার। সেই রোনাল্ডো কিনা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা! নাম ও দেশ ঠিক থাকলেও এই রোনাল্ডো কিন্তু বিশ্বসেরা রোনাল্ডো নয়। ব্রাজিলের নতুন প্রতিভা এই রোনাল্ডোকে ভক্তরা তাই নাম দিলেন রোনালদিনহো, যার অর্থ 'ছোট রোনাল্ডো'। আর অঞ্চলের কারণে নামের সঙ্গে যুক্ত হয় গাউচো। এই রোলানদিনহো গাউচোকেই এবারের বিশ্বকাপের একমাত্র নতুন সুপারস্টার বলা যায়।

নিক নেম অবশ্য রোনালদিনহোর জন্য নতুন কোন ব্যাপার নয়। গ্রেমিওতে ১৯৯৭ সালে পেশাদার ফুটবলের শুরু করেন তিনি। সতীর্থদের বলের অফুরান যোগান দেবার কারণে তার নাম হয় রোনালদিনহো অ্যাসিস। অর্থাৎ যে অনেক বল যোগান দেয় বা অ্যাসিস্ট করে। গ্রেমিওতে তিনি দুর্দান্ত দু'টি মৌসুম শেষ করার পরই ব্রাজিলের বিখ্যাত হলুদ জার্সি তার গায়ে ওঠে ১৯৯৯ সালে লাটভিয়ার বিরুদ্ধে। এরপর সে বছরই প্যারাগুয়েতে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকায় করেন সেই দুর্দান্ত গোল। যা তাকে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দেয়। অনেকে তুলনা করা শুরু করেন পেলের সঙ্গে। গ্রেমিওর তৎকালীন প্রেসিডেন্টের মতে, তারা তৈরি করছে ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। ২০০১ সালে প্যারিসে সেন্ট জার্মেইতে যোগ দেন নিজের খেলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য। কিন্তু ট্রান্সফার জটিলতার কারণে মাঠেই নামা হয়নি ছয় মাস। এরপর ফিরে মাতান ফ্রেঞ্চ লীগ। বিশ্বকাপের ঠিক আগে বহুদিন পর আবার ডাক পান জাতীয় দলে। যুগোশ্লাভিয়া ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে

ম্যাচ জয়ী পারফরমেন্সের পর জায়গা করে নেন জাপান-কোরিয়াগামী ব্রাজিলিয়ান স্কোয়াডে।

বিশ্বকাপে তার শুরুটা কিছুটা ধীর হলেও সময়ের সাথে সাথেই ঝলসে উঠছেন তিনি। প্রথম রাউণ্ডের তিন ম্যাচ এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডেও তিনি অনেক বলের যোগান দিয়েছেন রোনাল্ডো, রিভালদোকে। খেলেছেন সাড়া মাঠ জুড়ে। জুনিনহোকে সঙ্গে নিয়ে ধরে রেখেছেন ব্রাজিলের মধ্যমাঠ। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে তার পারফরমেন্স ছিলো দৃষ্টিসুখকর। '৬০ ও '৭০-এর দশকের ব্রাজিলিয়ান খেলা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐ খেলায়। প্রথম গোলটির জন্য রিভালদোকে বলের যোগান দিতে গিয়ে বডি ডজে একে একে ছিটকে ফেলেছেন চারজন ইংলিশ মার্কারকে। নিজেদের সীমানায় বল ধরে যেভাবে তিনি চারজনকে কাটিয়ে তুলে দিয়েছেন রিভালদোর পায়ে, তা অবিশ্বাস্য! তার গ্রেটনেস দেখা যায় দ্বিতীয় গোলের সময়ও। অসাধারণ সৃজনশীলতার প্রমাণ রেখে ইংলিশ গোলরক্ষক সিম্যানের মাথঅর ওপর দিয়ে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, তিনি ঐ শটটি সরাসরি পোস্টে নেবেন।

এবারের বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে নজর কাড়ার মতো খেলোয়াড় খুব বেশি দেখা যায়নি। যে দু'একজন দেখা গিয়েছে, তার ভেতর 'ছোট রোনাল্ডো' যে সেরা তা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। পেলে, ম্যারাডোনার মতো এককভাবে বিশ্বকাপ মাতানোর ক্ষমতা কেবল তার ভেতরই দেখা গেছে। এ বিশ্বকাপে যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গেছে, আগামীতে তা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে বলেই বোদ্ধাদের ধারণা।

ছোট রোনাল্ডোর আনন্দ বেদনার কয়েকটি মুহূর্ত

অন্য জায়গায়। তিনি তার দলের ২৩ জন খেলোয়াড়ের চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চেনেন। কোন অবস্থায় খেলোয়াড়দের দিয়ে কি করিয়ে নিতে হবে, সেটা তিনি ভালোই জানেন। আর সে জন্যই রক্ষণাত্মক কৌশল থেকে আক্রমণাত্মক কৌশলে দলকে ট্রান্সফার করা তার জন্য কোনো সমস্যাই হয়নি। এতে লাভ হয় আরেকটি। শিরোপা প্রত্যাশী অন্য দলগুলো ব্রাজিলকে নিয়ে যে হোমওয়ার্ক করেছিলো, তা পুরোপুরি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। কারণ ব্রাজিল তো আবার ফিরে গেছে অতি চেনা সেই সাম্বা ফুটবলে।

গোল্ডেন বলের অন্যতম দাবিদার জার্মানির বালাক

প্রথম ম্যাচ ব্রাজিল খেলতে নামে তুরস্কের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে ব্রাজিল প্রথমবারের মতো খেলতে নামে ফেভারিটের লেবেল গায়ে না লাগিয়ে। চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের খেলার দিকে মনোযোগ দেয় তারা। এমারসন আহত হবার কারণে স্কলারি সে পজিশন বেছে নেন গিলবার্টো সিলভাকে । আর মিডফিল্ডের অন্য স্থানটি পূরণ করেন জুনিনহোকে দিয়ে। যদিও স্কলারির ডিফেন্সিভ মানসিকতা অনুযায়ী ক্লেবারসনই হতে পারবেন কোচের প্রথম পছন্দ। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে বিগ ফিল বেছে নেন অ্যাটাকিং অপশন। স্কলারি বুঝতে পারেন গোল ঠেকিয়ে শিরোপা জেতা যাবে না। বিশেষত যখন এমারসন নেই। তাই আক্রমণভাগের শক্তি বাড়ান কোচ। তুরস্কের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই অ্যাটাকে গেছে ব্রাজিল। ধারার বিপরীতে গোল খেয়ে বসে তারা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসে দুর্দান্তভাবে, রিভালদোর ক্রসে রোনালদো করেন প্রথম গোল। বিতর্কিত পেনাল্টিতে দ্বিতীয় গোলটি করেন রিভালদো। ম্যাচ জিতে যায় ব্রাজিল। শুরুতে এই কঠিন ম্যাচের পরে প্রথম রাউন্ডে ব্রাজিলকে আর শক্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়নি। চীন ও কোস্টারিকাকে তারা হারায় হেসে খেলেই। রোনাল্ডো, রিভালদো গোল পান উভয় ম্যাচেই। কিন্তু ডিফেন্সের দুর্বলতার চিত্রও ফুটে ওঠে সেই সঙ্গে। কাফু, কার্লোস খেলেছেন উইঙ্গার হিসেবে। তাদের মূল দায়িত্ব যে রক্ষণভাগ সামলানো, সেটা তাদের খেলা দেখে মনে হয়নি। দ্বিতীয় রাউন্ডে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। যার ফলে ডিফেন্সে সৃষ্টি হয় বিশাল গ্যাপ। সেখান দিয়ে প্রায়ই ঢুকে পড়ছিলেন উইলমোর্টস। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে ব্রাজিলের। উইলমোর্টসের একটি পরিষ্কার গোল ফাউলের অজুহাতে বাতিল করেন রেফারি। এরপর রিভালদো ম্যাজিক। রোনালদিনহোর উঁচু লবে বুক দিয়ে নামিয়ে চকিত টার্নে মার্কার ছিটকে ফেলে যেভাবে বাঁ পায়ের ভলিতে গোলটি করলেন, তা অপূর্ব। এরপরও খেলায় ভালোভাবেই ছিলো বেলজিয়াম। কিন্তু শেষ সময়ে রোনাল্ডোর গোল তাদের কফিনে শেষ পেরেক ঢুকে দেয়। ব্রাজিল উঠে যায় কোয়ার্টার ফাইনালে। তৈরি হয় ব্রাজিল-ইংল্যান্ড ক্লাসিকের ক্ষেত্র।

বিপক্ষ দল কড়া মার্কিংয়ে রাখছে ক্লোসাকে

ম্যাচটি অনেক দিক থেকেই ছিলো ঐতিহাসিক। বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত তিনবার তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলো। জয়ের পাল্লা ভারী ব্রাজিলের দিকেই। ১৯৫৮ সালে প্রথম সাক্ষাতের খেলাটি ড্র হলেও ১৯৬২ সালে ব্রাজিল জেতে ৩-১ গোলে। আর ১৯৭০ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপে ব্রাজিল-ইংল্যান্ড খেলাটি ছিলো দু'দলের খেলোয়াড়দের অপূর্ব নৈপুণ্যে ভাস্কর দুর্দান্ত এক ম্যাচ। ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাংকস পেলের দুর্দান্ত হেডটি আরো দুর্দান্তভাবে ঠেকিয়ে দেন। শতাব্দীর সেরা সেভ হিসেবে যা পরবর্তীকালে সবাই মেনে নিয়েছেন। তবে এবারের কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ব্রাজিল মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এগিয়ে ছিল। বিশ্বকাপে যে তিনবার তারা ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিলো, প্রতিবারই শিরোপা গিয়েছিল ব্রাজিলের ঘরে। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপের ফর্ম বিবেচনায় প্রায় সবাই এগিয়ে রেখেছিলেন ইংল্যান্ডকে। দুর্দান্ত ডিফেন্স নিয়ে ৪ খেলায় তারা গোল খেয়েছে মাত্র ১টি। আক্রমণভাগ গোল দিয়েছে ৫টি। অন্যদিকে ব্রাজিল চার ম্যাচে গোল দিয়েছে ১৩টি, খেয়েছে ৩টি। কিন্তু খেতে পারতো আরো ৫/৬টি। সুকুর, উইলমোর্টস, ওয়ানচোপ সেগুলো মিস করেছেন। কিন্তু ওয়েন, হেস্কিরা তা করবেন না। এদিক থেকেই এগিয়ে ছিলো ইংল্যান্ড। মাঠের যুদ্ধের আগেই শুরু হয়ে গেলো কথার যুদ্ধ। ইংলিশ মিডিয়া হুংকার ছাড়লো, আর্জেন্টিনাকে দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেছি। এবার ব্রাজিলকে দিয়ে সারবো লাঞ্চ। ব্রাজিলের গোলরক্ষক মার্কোস পাল্টা

বিশ্বকাপে জ্বলে ওঠার জন্য আরো দুটো ম্যাচ হাতে পেলেন রোনাল্ডো

খেলা শেষে বেকহামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন কার্লোস

চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লো। তার মতে, ব্রাজিল প্রতিদিন যে রিজার্ভ দলের সঙ্গে অনুশীলন করে, সে দলও ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো। সুতরাং ইংল্যান্ডকে হারাতে ব্রাজিলের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু বল মাঠে গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো ভিন্ন দৃশ্য। দু'দলই উভয়কে সমীহ করে খেলছে। বল নিজেদের পায়ে রেখে আক্রমণ করতে চাচ্ছেন। খেলার ২৫ মিনিটের মাথায় একটি হাস্যকর ভুল করে বসেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার লুসিও। বল জমা পড়ে ওয়েনের পায়ে। ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান ওয়েন। অথচ তার আগে-পরে ওয়েনকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাজের কাজটি সময়মতো ঠিকই করেছেন। গোল খাবার পর সবাই ধরেই নিয়েছিল যে ব্রাজিল আহত সিংহের মতো ইংল্যান্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা না করে তারা নিজেদের খেলাটাই খেলে যেতে থাকে। দলের আক্রমণভাগের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিলো। তারা জানতো, বল ধরে রেখে খেললে ব্রাজিল গোল পাবেই। সে জন্য 'প্যানিক' হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে এ ম্যাচ ব্রাজিল খেলতে নেমেছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন স্ট্রাটেজিতে। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুনিনহোকে বসিয়ে প্রথম একাদশে নামায় ক্লেবারসনকে। যার পরিচিতি মূলত ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে। ডিফেন্সের দুর্বলতা ঢাকার জন্য স্কলারি কার্লোসকে বেশি উপরে না ওঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজ হয় তাতে। ডিফেন্স জমাট বেঁধে যায়।

উপহার হিসেবে একটা গোল পাবার পর ইংল্যান্ড রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এতোগুলো ব্যক্তিগত স্কিলসমৃদ্ধ ব্রাজিলকে বাকি ৬৫ মিনিট গোল দেয়া থেকে বিরত রাখা যে সম্ভব নয়, সেটা তাদের বোঝা উচিত ছিলো। 'প্যানিক' না হলেও এ সময় ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের ভেতর একটা মরিয়া ভাব দেখা যায়। প্রতিটি বলের জন্য দু'তিনজন মিলে চার্জ করছে, রোনাল্ডো মিডফিল্ডে নেমে চার্জ করে বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিচ্ছে, এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। চোয়াল শক্ত করে লড়ে যেতে থাকে তারা। সবচেয়ে বড় কথা, বলের দখল ছিলো বেশিরভাগ সময় ব্রাজিলের কাছেই। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে এর ফলও পায় তারা। গোলদাতা রিভালদো হলেও গোলটির মূল কৃতিত্ব রোনালদিনহোর। নিজেদের সীমানায় বল পেয়ে তিনি এক ম্যাজিক দৌড়ে ঢুকে যান ইংল্যান্ডের পেনাল্টি বক্সে। একে একে ছিটকে ফেলেন চার চারজন মার্কারকে। সবাই ভাবছিলেন গোলের জন্য ট্রাই করবেন তিনিই। কিন্তু বিপক্ষের গোল সীমানার সামনে তিনি যখন পৌঁছে গেছেন, তখন তার চারপাশে পাঁচজন ইংলিশ খেলোয়াড়। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রোনালদিনহো ইনসাইড-আউটসাইড ডজ দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসেন রিভালদোর মার্কারকে। ফ্রি হয়ে যান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাঁ পা। রোনালদিনহোর সুন্দর মাইনাসে অসাধারণ ফিনিশিংয়ের স্বাক্ষর রাখেন রিভালদো। সিম্যানকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়িয়ে যায় জালে। ম্যাচে ফেরে ব্রাজিল সেই সাম্বার তালেই।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবারও সৃজনশীলতার প্রমাণ দেন রোনালদিনহো। প্রায় ৩৫ গজ দূরে আপাত নিরীহ গোছের একটি ফ্রি কিক পেয়েছিলো ব্রাজিল। ফ্রি-কিক নিচ্ছেন 'ছোট রোনাল্ডো'। সবাই ভাবলো ক্রস করবেন তিনি। কিছুটা এগিয়ে এলেন ইংলিশ গোলরক্ষক সিম্যানও। ভাগ্য পরখ করতে চাইলেন রোনালদিনহো। সরাসরি শট মারলেন পোস্টে। অবাক সিম্যানের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে তা জড়িয়ে পড়লো জালে। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা ব্রাজিল শিবির। অবশেষে বিশ্বকাপে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখাতে শুরু করেছেন রোনালদিনহো। 'ট্রিপল আর' ফর্মেশনের সামনে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একের পর এক প্রতিপক্ষ। গোল পাবার পরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো ব্রাজিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ করে দশ জনের দলে পরিণত হয় ব্রাজিল। ড্যানি মিলস্‌কে ফাউলের অপরাধে মেক্সিকান রেফারি র‍্যামজ লাল কার্ড দেখান ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়কে। বিমূঢ় হয়ে যায় গোটা ব্রাজিল দল। হাসতে হাসতে মাঠে থেকে বেরিয়ে আসেন রোনালদিনহো। ঐ কষ্টের হাসিই হয়তো অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকবে সতীর্থদের। ম্যাচের আয়ু তখন ৫৭ মিনিট। বাকি সময়টা একজন খেলোয়াড় কম নিয়েও ব্রাজিল ইংল্যান্ডকে গোল বঞ্চিত রাখবে, খোদ ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদেরও এ বিশ্বাস ছিলো না। কিন্তু ব্রাজিলের ডিফেন্স যেন সেদিন অতিমানবীয় হয়ে উঠেছিল। লুসিও'র ঐ একটি ভুল ছাড়া গোটা ম্যাচ তারা খেলেছে দুর্দান্ত।

আরো একটি গোল, আরো একবার ব্রাজিলের ত্রাণকর্তা রিভালদো

রিভালদো তথা ব্রাজিলের সাফল্যে উল্লসিত ভক্ত

নিশ্ছিদ্র রেখেছে নিজেদের রক্ষণভাগকে। বাতাসে কিংবা গ্রাউন্ডে– কোথাও তাদের দুর্বলতা দেখা যায়নি। ম্যান টু ম্যান মার্কিংয়ে তারা কুশলতার পরিচয় দিয়েছে। মার্কাররা সবসময় ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের গায়ে গা লাগিয়ে থেকেছে। খেলার জন্য খুব বেশি স্পেস তারা পায়নি। বিগ ফিল খেলার ৭০ মিনিটের মাথায় টেকনিক্যাল কারণে রোনাল্ডোকে তুলে নেন। মাঠে আসেন এডিলসন। কোচের এ সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, অন্তত দু'জন ইংলিশম্যান তাকে মার্ক করে রেখেছিলো। ফলে রিভালদো, রোনালদিনহো খেলার জন্য বাড়তি স্পেস পেয়েছিল। এডিলসন নেমে তেমন কিছু করতে পারেননি। অন্যদিকে ইংলিশ কোচ এরিকসন সিনক্লেয়ারের বদলে ডায়ারকে নামিয়ে আক্রমণে গতি আনতে চেয়েছেন, কিন্তু তা হয়নি। ডায়ার পুরোপুরি সুস্থ নন। তার বদলে জো কোলকে নামানো যেতো। ৮০ মিনিটের

এমনিভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন প্রতিটি কোরিয়ান খেলোয়াড়

'তুমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০ মিনিট খেলার যোগ্যও নও' এ কথাটি বলেছিলো কোরিয়ার কোচ গাস হিডিংক আনজুং হুয়ানকে। সেই আন নিজেকে তৈরি করেছেন। পরিশ্রম করেছেন। এখন তিনিই কোরিয়ার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ফুটবলার। তাকে বলা হয় কোরিয়ার 'হার্টথ্রব'– কোরিয়ার বেকহাম।

বছর দুই আগে আন খেলতেন কোরিয়ান লীগে। তারপর পাড়ি জমান ইটালির পেরুজিয়া ক্লাবে। বর্তমানে ক্লাবটি 'সিরি বি'তে খেলে। ইটালির বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডে গোল্ডেন গোল করেন 'গোল্ডেন বয়' আন। তার পরের দিন খবর আসে পেরুজিরা বরখাস্ত করেছে তাকে। বিশ্ববাসী অবাক। এটি কোন ধরনের ইউরোপীয় ভদ্রতা? কোরিয়া ও এশিয়ার ফুটবল ফেডারেশন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু তার পরের দিনই পেরুজিয়া আবার আনকে ফিরিয়ে নেয়। বলে এটি ছিল উন্মাদ দেশাত্মবোধ। তারা ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরিয়ে নেয় তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আনকে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে স্পেনের অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ।

আন প্রথম গোল অবশ্য করেন এবার আমেরিকার বিপক্ষে। আমেরিকা তখন ১ গোলে এগিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে গোল দিয়ে দলকে সম্মানজনক ড্র উপহার দেন তিনি। ইটালির বিপক্ষে গোল দিয়ে তিনি হিরো বনে যান। কিন্তু হারলে তাকেই ভিলেন হতে হতো। কারণ খেলার প্রথম পাঁচ মিনিটের মাথায় পেলান্টি মিস করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার দিন সেদিন সুপ্রসন্ন ছিলো বিধায় শেষ পর্যন্ত গোল দিয়ে ইটালির মতো পরাশক্তিকে ধরাশায়ী করেন।

আন জুং হুয়ান ২৩ বছরের বিবাহিত যুবক। লম্বা চুল ও ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি হওয়ায়, টিভি পর্দায় তাকে ভালোভাবেই চেনা যায়। এই ১৯ নম্বর যে কোরিয়াবাসীর হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে স্থান দিয়েছে অন্যান্য বীরদের সঙ্গেই। তাকে এশিয়াবাসী মনে রাখবেন চিরকাল। কারণ এশিয়ার ফুটবলকে তিনি এতদূর নিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন। আশা করি ইউরোপের বড় ক্লাবে আমরা তার বীর পদচারণা খুব শীঘ্রই দেখবো– আর এশিয়াবাসী হিসেবে গর্বিত হবো আমরা।

মাথায় মাঠে নামানো হয় ভ্যাসেল, শেরিংহামকে। পুরো ম্যাচে নিষ্প্রভ (অবশ্যই গোলটি ছাড়া) ওয়েনকে এতোক্ষণ খেলানোর কোনো যুক্তি ছিলো না। ব্রাজিল বুদ্ধিদীপ্ত খেলে হতাশ করেছে ইংল্যান্ডকে। আরো গোলের জন্য চেষ্টা না করে তারা চেয়েছে বলের দখল নিজেদের কাছে রাখতে। ছোট ছোট পাসে নিজেদের মধ্যে বল আদান-প্রদান করেছে। ইংল্যান্ডের খেলায় ক্লান্তির ছাপ ছিলো স্পষ্ট। শিজুওকার আর্দ্রতার সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারেনি। খেলোয়াড়দের ভেতর অভাব ছিলো 'কিলার ইনসটিংক্ট'-এর। ফলে ৩৭ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলে ম্যাচটা ঠিকই বের করে নেয় ব্রাজিল। ১০ জন নিয়ে প্র্যাকটিস করার সুফল এ ম্যাচে তারা ভোগ করে। যদিও এ নিয়ে তখন ব্রাজিলিয়ান মিডিয়ায় বেশ সমালোচনা হয়েছিলো। টেকনিক ও ট্যাকটিক্সের এ খেলায় ব্রাজিলের জয়ের পেছনে তাই কোচ স্কলারির অবদান অনেক।

যান্ত্রিক জার্মানি

সাধারণ জার্মানি সাদামাটা খেলা খেলেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল। কোয়ার্টারে উজ্জীবিত আমেরিকাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে নবমবারের মতো বিশ্বকাপের সেমিতে খেলার অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছে।

তবে এই খেলায় সেরা দল ছিল অবশ্যই ব্রুস অ্যারেনার দল। শক্তিমান জার্মানদের থেকেও অনেক সময়ই তাদের স্পিড সবাইকে

মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই জয়ের জন্য জার্মানদের ধন্যবাদ জানানো উচিত প্রথমে ওলিভার কান ও তারপর রেফারিকে।

জার্মানির খেলা এবার একটুও চোখে পড়েনি। সৌদি আরবকে ৮-০ গোলে হারালেও সবার মনে সন্দেহ ছিল ভালো দলের বিপক্ষে কতোটা প্রভাব ফেলবে জার্মানরা। উত্তর মেলে দ্বিতীয় খেলা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই। ১ গোল করে এগিয়ে থেকে খেলা শেষ করতে চেয়েছিলো তারা। কিন্তু আইরিশরা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়ে জার্মানদের সেদিন কাঁদিয়ে ছেড়েছিলো। ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে এক নোংরা ম্যাচে কোনোমতে ১ গোল দিয়ে বেরিয়ে আসে বালাক বাহিনী। সেই খেলায় তারা হারলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকতো না। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে খেলে জার্মানি। সেই খেলাটিকে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের সবচেয়ে অনুত্তেজক বললেও কম বলা হবে। এমনকি রুডি ফয়লার নিজে বলেছেন, প্রথমার্ধে আর যাই হোক ফুটবল খেলা হয়নি। কোনোমতে ২ মিনিট আগে নয়ওইল গোল করে দলকে বাঁচিয়ে দেন। শুধু চরম মানসিক শক্তির কল্যাণেই এতদূর উঠে এলো এই ঐতিহাসিক পরাশক্তি।

আমেরিকা এই বিশ্বকাপে তাদের ফুটবল ইতিহাসে সেরা খেলা উপহার দেয়। সেনেগাল, কোরিয়াকে নিয়ে যেরকম উত্তেজনা দেখা গিয়েছিলো দর্শকদের মধ্যে, আমেরিকাকে নিয়ে কারো মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়নি। কিন্তু দলটি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে খেলে সফলতা পেয়েছে। পর্তুগালের বিপক্ষে তাদের খেলা সবাইকে হতবাক করে। কোরিয়ার সঙ্গে ভালো খেলেই ড্র করে। কিন্তু আবার পোল্যান্ডের বিপক্ষে বাজে খেলে হেরে বসে। দ্বিতীয় রাউন্ডে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ৯০ মিনিটে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঠিকই ২-০ গোলে জিতে যায় মার্কিনিরা। অবশ্য রেফারির ভুলের কারণে একটি পরিষ্কার পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মেক্সিকো। তবুও পুরো বিশ্বকাপে তারা ভালো খেলেছে।

জার্মানির পক্ষে বালাক গোল দিলেও মূল নায়ক অধিনায়ক কানই। তিনি কিছু চমৎকার গোল ঠেকিয়ে দেশের মুখ বাঁচিয়েছেন এই যাত্রায়। আর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে একটি নিশ্চিত গোল থেকে মার্কিনিদের বঞ্চিত করা হয় এবার। বলটি ডিফেন্ডারের হাতে লাগলেও আসলে গোল লাইন পার হয়েছিলো। কোনোমতে সেমিতে উঠে যায় তারা।

স্পিরিটেড কোরিয়া

এশিয়ার গর্ব কোরিয়া প্রজাতন্ত্র। সর্ববৃহৎ মহাদেশ থেকে প্রথম কোনো দেশ সেমিফাইনাল খেলার গৌরব অর্জন করলো। কোরিয়ার অধিনায়কের

প্রতিটি বলের জন্যই লড়তে হয়েছে স্পেনিসদের

টুর্নামেন্টে তুরস্কের সেরা খেলোয়াড় হাসান সাস

শেষ শটটি যখন স্পেনের ইকর ক্যাসিয়াসকে পরাজিত করে তখন পুরো গুয়াঙ্গু, কোরিয়া, এশিয়া এবং তাবৎ পৃথিবী একসঙ্গে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

কোরিয়া প্রথম বিশ্বকাপ খেলে ১৯৫৪ সালে। তারপর ১৯৮৬ থেকে টানা ৬বার। এই বিশ্বকাপের আগে তারা খেলে ১৪টি ম্যাচ, জয় পায়নি একটিতেও। কিন্তু এবার কাহিনী পুরো ভিন্ন। সেমির আগ পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচে ৪টি জয়, ১টি ড্র। ৪টি নাক উঁচু ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ড, পর্তুগাল, ইটালি ও স্পেনকে হারায় কোরিয়ানরা। ড্র করে আমেরিকার বিরুদ্ধে। এশিয়ার ফুটবল মান, ইতিহাস হিসাবে রেখে বলা যায়, এটি এক অতি মানবীয় সাফল্য। এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে বিশ্ববাসী চিনতে পেরেছে আন্ জুং হুয়ান, সিয়ল, পার্ক, চাদুরি, হোয়াং, সাং চুল এবং পুরো কোরিয়া ও সে অর্থে জাপানের ফুটবলকে।

কোরিয়ার এখন মধ্যমণি বীর ফুটবলাররা তো বটেই, তার সঙ্গে অবশ্যই কোচ গাস্ হিডিংক। তিনি জাতিতে ডাচ। রিয়েল মাদ্রিদ, হল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ তিনিই। গত বিশ্বকাপে তিনি কোচ ছিলেন হল্যান্ডের। প্রথম রাউন্ডে পরাজিত করে কোরিয়াকে ৫-০ গোলে। তারপর কিছুদিন পর সেই কোরিয়াই তাকে কাছে টেনে নেয়। কোরিয়ার দায়িত্ব বুঝে

নেবার পর এককালের দুর্বল দলটিকে রাতারাতি বদলে দেন তিনি। কঠোরভাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সুসংহত করেন দলীয় সংহতি। এখন তারকা হলেন আন। অথচ তাকেই হিডিংক বলেছিলেন যে তুমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০ মিনিট খেলার যোগ্যও নও। কোচের কথা শুনে নিজের স্বাস্থ্য ও শৈলীর ওপর তিনি নজর দেন। যার ফল তিনি এবার পেলেন। এভাবেই দলকে পথ বাতলে দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ কোচ।

কোরিয়ার এই সাফল্যের পেছনে স্বাগতিক দেশ হওয়াটা একটি জোরালো কারণ। তাদের বিশাল লাল সমর্থক বাহিনী দলকে সবসময় মাঠে ও বাইরে উৎসাহ জুগিয়েছে। তবে এই কথা বললে কোরিয়ার সাফল্যকে খাটো করা হয়। হিডিংক-এর শিক্ষা ছিলো ইউরোপিয়ান ধাঁচ। কোরিয়াকে শিখিয়েছেন হল্যান্ডের আবিষ্কার 'টোটাল ফুটবল'। কোরিয়ার অফুরন্ত দম, গতি, শৈলী ও পরিচ্ছন্ন খেলা অবাক করে সবাইকে। কোয়ার্টারে অভিজ্ঞ স্পেনের বিপক্ষে সমান তালে লড়ে ম্যাচ বের করে নিয়ে আসে। পরিচয় দেয় নিজেদের লড়াকু মনোভাবের। আমরা আশা করি কোরিয়া ও জাপানের সাফল্য এশিয়ার ফুটবল বহুদূর নিয়ে যাবে। এশিয়া একদিন বিশ্ব ফুটবল শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে কোরিয়া ও জাপানের এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে।

সুকুর ফ্লপ হলেও দল পৌঁছেছে সেমিফাইনালে

আন্ডারডগ তুরস্ক

১৯৫৪ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসেই সেমিতে পৌঁছে গেছে তুরস্ক। সে পথে ব্রাজিলের সঙ্গে হারের পর কোস্টারিকার সঙ্গে ড্র এবং চীনের সঙ্গে জেতে। গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে চীনের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় তুরস্কের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে জাপানের বিরুদ্ধে তুরস্ককে প্রথম একাদশের ২/৩ জন খেলোয়াড় ছাড়াই খেলতে হয়। ইনজুরি ও কার্ডজনিত সমস্যায় তারা জাপানের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। উপরন্তু ছিলো জাপানের দর্শক-সমর্থন। এসব কোনো কিছুই তুরস্কের বিজয় রথ থামাতে পারেনি। ১-০ গোলে ঠিকই তারা ম্যাচটি বের করে নেয়। আসলে তুরস্ক এমন একটি টিম, যারা গোল ডিফেন্ড করতে জানে। পুরোপুরি পেশাদার ইউরোপিয়ান দল। সে কারণে জাপানের বিরুদ্ধে গোল দিয়েই তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, কোয়ার্টারে তারা খেলছে। বাকি সময় জাপান আক্রমণ করলেও তুরস্ক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেগুলো ঠেকিয়েছে। বল রেখেছে নিজেদের পায়ে, জাপানের গতিশীল খেলা স্লো করে দিয়েছে। ফলে আক্রমণে কখনোই দানা বাঁধতে পারেনি জাপান। কোয়ার্টার ফাইনালের দু'প্রতিপক্ষ তুরস্ক-সেনেগাল উভয়েই ছিলো নির্ভার। কোরিয়া-জাপানের উদ্দেশে তারা যখন দেশ ছাড়ে, তখন এতদূর পর্যন্ত তাদের কল্পনায় ছিলো না। কোয়ার্টার ফাইনালে সেনেগালের খেলায় ছিলো 'সব পাবার রেশ'। যেন আর কিছুই পাবার নেই তাদের। অন্যদিকে তুরস্কের খেলোয়াড়রা পুরোপুরি পেশাদার মনোভাব নিয়ে খেলেছে। গ্যালাতাসারের হয়ে বহু বছর তারা একসঙ্গে খেলেছে। জিতেছে ইউএফা কাপ। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে খেলতে তারা অভ্যস্ত। সে কারণে সেনেগালের বিরুদ্ধে খেলায় এ পেশাদারিত্ব চোখে পড়ে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও তুরস্কের প্রাধান্য ছিলো পরিষ্কার। বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগও তারা তৈরি করে। ফাঁকা পোস্ট পান বারকয়েক। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থতা উপহার দেন অধিনায়ক সুকুর। ফাঁকা পোস্টে বল ঠেলতে তিনি যেভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, তা হাস্যকর। ঢাকা লীগের খেলোয়াড়রাও ঐসব বল জালে ঠেলতে পারে। তার ব্যর্থতার পরও ম্যাচটি গোল্ডেন গোলে জিতে যায় তুরস্ক। অতিরিক্ত সময়ে ইহলান মাদজিজ মহাগুরুত্বপূর্ণ এ গোলটি করে দলকে নিয়ে যান সেমিফাইনালে।

গত দু'বিশ্বকাপে তাদের মান অনুযায়ী খেলতে ব্যর্থ হয় জার্মানরা। এবার আরও সাদামাটা দল নিয়ে আসে কোরিয়া-জাপান। সুবিধাজনক দলের সঙ্গে খেলা পড়ায় এই যাত্রায় বেঁচে যায় যান্ত্রিক জার্মান ফুটবল দল। সেমিফাইনালে তাদের খেলতে হবে বিস্ময় কোরিয়ানদের বিপক্ষে। জার্মানদের যে সেই ৯০ বা ১২০ মিনিট সুখকর হবে না তা এখনই বলা যায়। তবুও চতুর ফয়লারের দলই যে ফাইনালে ওঠার জন্য ফেভারিট একথা বলতেই হয়।

প্রথম পর্বে 'সি' গ্রুপের শীর্ষ দু'টি দল ব্রাজিল-তুরস্ক মুখোমুখি হচ্ছে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। ২৬ জুন সাইতামায় বাংলাদেশ সময় ৫-৩০ মিনিটে মুখোমুখি হবে এ দু'দল। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাদের বিরুদ্ধে বেশ ভুগতে হয়েছিলো ব্রাজিলকে। আগে গোলও খেয়েছিলো। কিন্তু রোনাল্ডো, রিভালদোর মিলিত নৈপুণ্য এবং রেফারির আনুকূল্যে সেবার পার পায় ব্রাজিল। সেমিতেও তারা যথেষ্ট ভোগাবে বলে মনে হয়। অবশ্য ব্রাজিল তখন ছিলো অনেক অগোছালো। স্কোয়াডের সবাই সবাইকে তখনো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু এখন ব্রাজিল দলের সমঝোতা অপূর্ব। প্রতি ম্যাচেই তারা উন্নতি করছে। প্রথম পর্বের বিতর্কিত জয় ঢেকে ফেলতে ব্রাজিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আক্রমণের পর আক্রমণ করে ঝাঁঝরা করে দেবে তুরস্ককে। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচিং অর্ডার পাবার কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে খেলবেন না রোনালদিনহো। সে পজিশনে খেলবেন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে খেলা জুনিনহো। তবুও ব্রাজিল কিছুটা সৃজনশীলতার অভাবে ভুগবে। বিশেষত কোয়ার্টার ফাইনালে রোনালদিনহোর এমন একটি দুর্দান্ত ম্যাচ খেলার পর। তবে এ ম্যাচে কার্লোস আবার তার অ্যাটাকিং রোলে ফিরে যাবেন। ফলে দু'উইং থেকে বলের যোগান অনেক বেড়ে যাবে। ইনজুরির কারণে রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে সামান্য সংশয় রয়েছে। তিনি খেলতে না পারলে ব্রাজিলের সমস্যা হবে। 'ট্রিপল আর'-এর দু'জন না খেললে রিভালদোকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। অন্যদিকে তুরস্কের লক্ষ্য থাকবে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলা। সেজন্য প্রয়োজনে তারা প্রয়োগ করবে শারীরিক শক্তি। সেক্ষেত্রে ব্রাজিলকে মাথা ঠাণ্ডা করে খেলতে হবে। তা না হলে খেলাটি জঘন্য ফাউলে ভরপুর হতে পারে। তবে নিজেদের খেলার ৭০% খেলতে পারলেই তারা অনায়াসে পৌঁছে যাবে ফাইনালে। 'পেন্টা'র সুবাস পেতে থাকা ব্রাজিলিয়ানরা এ সুযোগটা কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

ছবি : এএফপি